জ্ঞান-পাগলা এক বুড়ো

শাহ মুহম্মদ খুরশীদ আলম

জ্ঞান-পাগলা এক বুড়ো

সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী

। এক । তেরোশো বত্রিশ ইছায়ীতে তিউনিসে ইব্‌নে খালদুনের জন্ম।

। দুই । তাঁর পূর্ব-পুরুষদের স্পেনের সেভিল থেকে পাট উঠিয়ে তিউনিসে আগমন ও বসবাস স্থাপন।

। তিন । শৈশবেই পবিত্র কুরআন, হাদিস, ধর্ম-শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও ছন্দ-প্রকরণ এবং দর্শনে ইব্‌নে খালদুনের অশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ। ব্যাপক তাঁর অনুশীলন। সুদূরপ্রসারী তাঁর আগ্রহ।

। চার । তেরোশো উন-পঞ্চাশ ইছায়ীতে তিউনিসের ইতিহাস খ্যাত ভয়াবহ মহামারী লেগে পিতা-মাতাকে হারান।

। পাঁচ । বারবার ভাগ্যান্বেষণের জন্যে দেশ থেকে দেশে গমন। তেরোশো বাষট্টি ইছায়ীতে স্পেনে গমন। নিষ্ঠুর পেড্রোর দরবারে রাজদূত হিসাবে যোগদান ও পূর্ব-পুরুষদের আবাস-ভূমি সেভিলে অবস্থানের সুযোগ।

। ছয় । পরবর্তী পর্যায়ে তিলমিসান, ফেজ, মরক্কো ও অন্যান্য স্থানে উঁচু শাহী পদ গ্রহণ।

। সাত । বারবার মহল-ষড়যন্ত্রের শিকার।

। আট । তেরোশো পঁচাত্তর ইছায়ীতে কালাহ্‌ ইব্‌নে সালামাহ্‌ নামক মহলে অবস্থান ও বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ "মুকাদ্দীমা" বা "বিশ্ব-ইতিহাসের মুখবন্ধ" রচনা। চার বছর লাগে এটি লিখতে। আরো বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ব্যাপক তাঁর অবদান।

। নয় । তেরোশো বিরাশী ইছায়ীতে কায়রো গমন এবং জীবনের শেষ চব্বিশটি বছর কায়রোতেই কালাতিপাত।

। দশ । কায়রোতে আস্‌বার সময় জাহাজ-ডুবিতে পরিবারের সকলের মৃত্যু-বরণ।

। এগারো । কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা।

। বারো । তেরোশো আটাশী ইছায়ীতে মক্কা গমন ও হজ্ব সমাপন।

। তেরো । চোদ্দশো ইছায়ীতে তাতার বীর তাইমুর লঙের সাথে সাক্ষাৎকার। তার মধ্যস্থতায় তাইমুরের হাত থেকে দামেশ্‌কে নগরীর অস্তিত্ব রক্ষা।

। চোদ্দ । কায়রোতে কাজী-উল-কুজাহ্‌ বা প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ।

। পনেরো । ইতিহাস, সভ্যতা, মানব সমাজের উত্থান পতন ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনবদ্য অবদান।

। ষোলো । চুয়াত্তর বছর বয়সে চোদ্দোশো ছয় ইছায়ীতে কায়রোতে ইন্তেকাল। কায়রোতেই কবর।

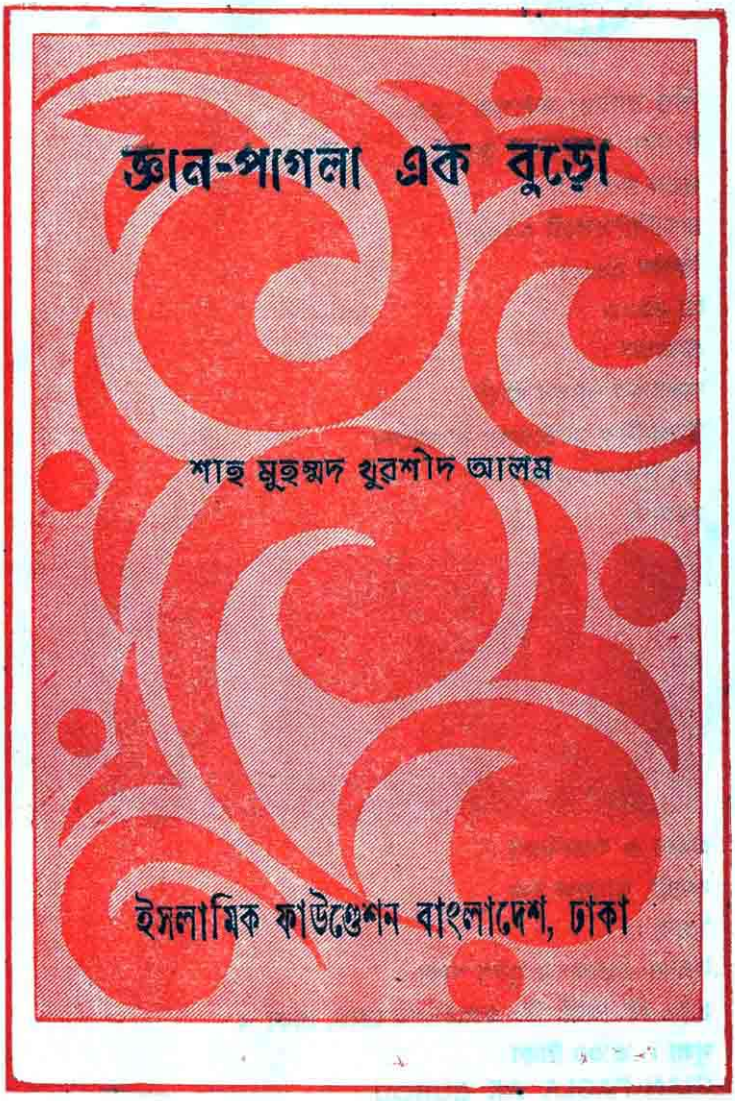
জ্ঞান-পাগলা এক বুড়ো
শাহ মুহম্মদ খুরশীদ আলম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

শিশু সাহিত্য প্রকাশনা : ৫১
ই. ফা. প্রকাশনা : ৩৩৪
প্রথম প্রকাশ :
জমাদিউস্‌সানী ১৪০০
বৈশাখ ১৩৮৭
মে ১৯৮০
প্রকাশক :
অধ্যাপক শাহেদ আলী
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭ পুরানা পল্টন
ঢাকা ২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
কাজী শামছুল হক
মুদ্রক :
সাঁকো প্রডাকশন মুদ্রণ শাখা
১৪৬ ডি. আই. টি. এক্সটেনশন রোড, ঢাকা ২
মূল্য : ৩·০০ টাকা
GIAN-PAGLA AK BUROU
Written by Shah Muhammad Khurshid Alam
and Published by Islamic Foundation Bangladesh to celebrate
the commencement of 1400 Al-Hijra. Price - Tk. 3·00

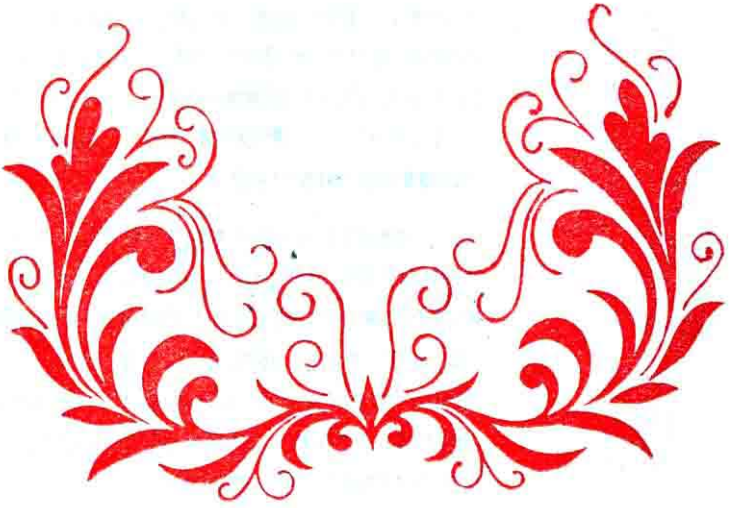

প্রকাশকের কথা

আমাদের শিশুকিশোরদের ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করার জন্যে ফাউণ্ডেশনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব মহান ও উন্নত মানুষ বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের জীবন-কথা ও অবদান বিষয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বইপত্র প্রকাশনা এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত।

এরকমই একজন মহাপুরুষ ইবনে খালদুন। একাধারে তিনি ধর্মবেত্তা, ব্যাকরণ-ও-ছন্দবিশারদ, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক। তাঁর বই "মুকাদ্দীমা" -র কথা সারা দুনিয়ার মানুষ জানে। তাঁর জীবনে আছে অনেক ওঠা-পড়া। এই মহান ও অসাধারণ জ্ঞানী মানুষটির জীবন কথা লিখেছেন শাহ মুহম্মদ খুরশীদ আলম।

শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা এই জীবন-কথা আশা করি, ভালো লাগবে তোমাদের।

গল্পের শুরু/নয়
তাতার-বীরের সামনে/দশ
একটি নাম/পনর
ইতিহাসের ব্যাখ্যায়/পনর
দেশ দেশান্তরে/আঠার
মহল-ষড়যন্ত্র/উনিশ
ঘটনার পুনরাবৃত্তি/চব্বিশ
স্বপ্ন-নগরী কায়রোতে/সাতাশ
আদালতে/একত্রিশ
জ্ঞানের শেষ নেই/উনচল্লিশ

ভূমিকা

ইব্‌নে খালদুন একটি নাম। একটি প্রতিষ্ঠান। ইব্‌নে খালদুন একটি আলোড়ন। একটি আন্দোলন।

তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যাপক। চিন্তাধারা সুদূর-প্রসারী। গভীর তাঁর জীবন-বোধ। বাস্তবতার কঠিন আবর্তে ধন্য তাঁর মতবাদ। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এগুলো প্রতিষ্ঠিত।

ইব্‌নে খালদুনের উপর আমার আগ্রহ বহুকাল ধরে।

তাঁর সম্পর্কে লেখা খুব সহজ নয়। তাও বাচ্চাদের জন্যে। এ একটি দুরূহ কাজ বলে আমার ধারণা।

তাঁকে ভালোবাসি বলেই আমার এ প্রয়াস। আশা করি বড়োরা বাচ্চাদের হাতে তুলে দেবেন আমার এ ছোট্ট বইটি।

বাচ্চারা খুশী হলেই আমি খুশী।

শাহ্ মুহম্মদ খুরশীদ আলম

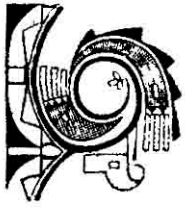

গল্পের শুরু

তোমাদের নানা কাহিনী পড়ে কৌতূহল জাগে। কৌতূহল তো জানার ইচ্ছা। এ জানার ইচ্ছা বা জ্ঞানই মানুষকে বড়ো করে। তোমরা পড়েছো হাদীসের মহাবাণী ঃ জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্র। অতএব বুঝতেই পারছো, মানুষের জ্ঞানই সবকিছু।

তলোয়ার থেমে যায় জ্ঞানীর কাছে। মহাবীরও তলোয়ার খাপে পুরে জ্ঞানীকে কোলাকুলি করেন। খুব অবাক লাগে—না? আসলেই কিন্তু এরকম হয় মাঝে-মাঝে।

সে রকম একটি কাহিনী জানতে চাও? নিশ্চয়ই তোমরা এ জাতীয় কিস্‌সা জানতে চাও। এ রকম জ্ঞানী কি আছেন? তলোয়ার তাঁর ঘাড়ে পড়েনি? উল্‌টা ঘাতক তলোয়ার খাপে রেখে দিলো। পাল্‌টা কোলাকুলি করলো। তোমরা ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছো দেখছি। খুব উৎসুক জানতে, তাই না? তাহ'লে শোনো এরকম একটি কাহিনী।

তাতার বীরের সামনে

বোধহয় তোমরা তাতার-বীর তাইমুর লঙের নাম শুনেছো। মস্ত বড়ো বীর। বড়ো হয়ে তাঁর অনেক কথা তোমরা জানবে। তিনি এক দুর্ধর্ষ বীর। দীলে তাঁর রহমত ছিলো না। পাহাড় পর্বত তিনি ডিঙিয়েছেন। নদী-নালা, সমুদ্দুর, মরুভূমি আর সমতল-ভূমি কোনো কিছুই তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষের রক্তে তাঁর আনন্দ। মানুষের মৃত্যুতে তিনি খুশি। লক্ষ লক্ষ তাতার-সৈন্য তাঁর। রূপকথার রাজার মতো তাঁর প্রতাপ।

তাইমুর রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছেন। অগুনতি মানুষ মেরেছেন। নগর বিলীন করে দিয়েছেন। দুর্দান্ত বীর তাইমুর। এক আতঙ্ক। ভয়াল তাঁর আক্রমণ।

বড়ো হয়ে তোমরা তাতার বীর তাইমুরের কাহিনী যতো পড়বে ততোই শিউরে উঠ্‌বে।

তাইমুরের আরেকজন পূর্বসূরীর নাম জানো? তাঁর নাম হালাকু খান। আরো ভয়ঙ্কর। আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটান তিনি। আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী বাগদাদ। হারুন আল-রশীদের বাগদাদ। আরব্য-উপন্যাসের এক হাজার এক রজনীর বাগদাদ। রূপকথার নগরী বাগদাদ। স্বপ্নের নগরী বাগদাদ।

বাগদাদ তখন পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো নগর। জমজমাট অবস্থা।

হালাকু খান আক্রমণ করেন এ বাগদাদ নগর। চল্লিশ দিন ধরে চলে তাঁর ধ্বংসলীলা। তস্‌নস্‌ ক'রে দিলেন পুরা বাগদাদ। সে এক অমানিশা। বিশ লক্ষ লোক বাস করতো তখন বাগদাদে।

আর এ বিশ লাখ লোকের মধ্যে পনেরো লাখ লোককেই কতল করলেন হালাকু খান। আর বাকি পাঁচ লাখ বেঁচে রইলো। তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুধু পৃথিবীকে জানিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় তাদের বাঁচিয়ে রাখা হ'লো।

আরো কি জানো? বাগদাদের বিশ্ব-বিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় মাটির সংগে মিশে গেলো। পুড়িয়ে ছারখার ক'রে

দেয়া হ'লো লাইব্রেরীর লাখো লাখো অমূল্য কিতাব। যতো ছিলো তথ্য আর হাদীস, কিছুই রাখা হ'লো না।

পনেরো লক্ষ মরা লাশ স্তূপাকার হয়ে রইলো। গন্ধ আর গন্ধ। বিটকেলে গন্ধ। এ গন্ধ সহ্য করতে পারলেন না হালাকু খান। মরা মানুষের গন্ধে অস্থির হ'য়ে তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজধানী থেকে বহু দূরে এসে তাঁবু গেঁড়ে থাক্‌লেন। বহু কাল পরে তিনি আবার বাগদাদে প্রবেশ করেন।

এহেন রক্ত-পিপাসু তাইমুর লঙ দামেশ্‌ক্‌ দখল করে নেন। দামেশ্‌কেরও তখন দারুণ জৌলুস।

সুন্দর নগর। চারিদিকে দেয়াল ঘেরা। বন্দী করা হ'লো দামেশ্‌কের জ্ঞানী-গুণী সবাইকে। এলাহি কাণ্ড। কি হয়! কার ভাগ্যে কি! তাইমুর কাকে রাখে কাকে মারে। এক ভয়াবহ অস্থিরতায় কাটায় সবাই। কার কি হয়!

তাইমুরের তরবারি তো কাউকে রেহাই দেয় না। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণী সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। সবাই প্রায় বন্দী। এখন সবারই চিন্তা কি ক'রে রেহাই পাওয়া যায় তাইমুরের তরবারি থেকে।

ফয়সালা হ'লে হয়তো রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কে করবে এ ফয়সালা? শলা-পরামর্শ চল্‌লো, কে এ ফয়সালার দায়িত্ব নিতে পারেন? চারদিকে ফিস্‌ফাস্‌ গুজ্‌গাজ্‌। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো কোনো একজনকে পাঠানো হবে তাইমুরের নিকট। এমন কাউকে পাঠানো দরকার যে তাইমুরকে কথা বলে ভোলাতে পারবে। তাইমুরের সামনে যাবার মতো বুকের পাটা তো চাই।

এ কঠিন দায়িত্ব নিতে পারে শুধু এক জ্ঞান-বুড়ো। সবাই তাঁকে ধ'রে বসলো। তিনিই জানেন সব কায়দা। তিনিই জানেন এসব বীরের স্বভাব। সবই একমত, এ জ্ঞান-বুড়োই সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এ ফয়সালার জন্যে।

কি ভাবে পাঠানো যায় তাও এক ফ্যাসাদ। দামেশ্‌ক্‌ নগরী দেয়াল-ঘেরা, আগেই বলেছি। এ দেয়াল ডিঙিয়ে কি ভাবে পাঠানো যায় তাঁকে তাইমুরের তাঁবুতে?

দেওয়ালে দড়ি বাঁধা হলো। এ দড়িতে বেঁধে জ্ঞান-বুড়োকে দেওয়ালের ওপাশে পার ক'রে দেওয়া হ'লো। দেখা যাক, কোনো শান্তি-চুক্তিতে আসা যায় কিনা তাইমুরের সঙ্গে। আর মেরেই যদি ফেলা হয় জ্ঞান-বুড়োকে, তা'হলে কি আর করা যাবে। বুড়োর তো আর আর কেউ নেই দুনিয়ায়।

তাঁকে দেয়াল পার ক'রে দেওয়া হ'লো। সবাই প্রহর গুনছে। আশায় মুহূর্তগুলি কাটাতে থাকে সবাই।

এ জ্ঞান-তাপস মুখোমুখি হলেন তাইমুরের। তাইমুরের ভাষা আরবী নয়। অথচ জ্ঞান-তাপস তাইমুরের মাতৃভাষা জানেন না। এখন কি ক'রে আলাপ-সালাপ চলে? জ্ঞান-বুড়োটি পড়লেন মুশকিলে।

অবিশ্যি মুশকিল-আসানও হ'লো। তাইমুরের সঙ্গে কয়েকজন আরবী-ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাইমুর এঁদের রাখতেন জয়ের সুবিধার জন্যে। এ আরবী-পণ্ডিতেরা আবার এ জ্ঞান-বুড়োর খ্যাতির কথা আগে থাক্‌তেই জানতেন।

জ্ঞান-তাপসের ছিলো সম্মোহনী-শক্তি। তাইমুর তাঁকে তো মেরে ফেললেনই না, বরং আলাপে বস্‌লেন। ঐ আরবী-পণ্ডিতরা দোভাষীর কাজ করলেন। জ্ঞান-বুড়ো যা বলেন, তা তাঁরা তাইমুরকে বুঝিয়ে বলেন। তাইমুর যা বলেন তাও তাঁরা বুঝিয়ে দেন জ্ঞান-বুড়োকে।

জ্ঞান-বুড়ো ইযযত করলেন তাইমুরকে। তাইমুরকে তিনি বোঝালেন দামেশ্‌ক-বাসীরা তাঁর নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে চায় বিনাযুদ্ধে। তবে তাইমুর কোনো রক্তপাত ঘটাতে পারবেন না, কাউকে যেন মারা না হয়।

কথা চলতেই থাকে। তাইমুরকে যেন জ্ঞান-বুড়ো আকৃষ্ট ক'রে ফেললেন। কতো আলাপ! আলোচনার পর আলোচনা। যেন কথার শেষ নেই। দোভাষীরা কথার মার-প্যাঁচে যেন হাবুডুবু খেতে লাগলেন। জ্ঞান-বুড়োর লেখা বহু কিতাবের বিষয়বস্তুর কথাও আলাপ হলো। তাঁর লেখা "বিশ্ব-ইতিহাসের মুখবন্ধ" নিয়ে কথা হ'লো অনেক। অবাক তাইমুর। এ যেন ভিন্‌দেশ। নতুন কথা।

মহাবীর তাইমুর যতোই শোনেন ততোই যেন তাঁর চোখ ছানা-বড়া হ'য়ে ওঠে। তাইমুরের কাছে আশ্চর্য লাগলো জ্ঞান-তাপসকে। লোকটি কতোই না জানেন! এমনকি, তাঁর চরিত্রের কথা, তাঁর তরবারির ঝনঝনানি, বিজয় ও জীবন-কাহিনী সবই যেন মুখস্থ বলে দিচ্ছেন লোকটি। তাতার বীরের কাছে এক অজানা জগত ধরা দিলো।

জ্ঞানবুড়োটি কেমন যেন নিশ্চিন্ত। ভাবলেশহীন। আদ্যি কালের বদ্যি বুড়োর মতো সব বলে দিচ্ছেন বুড়ো। জ্ঞান-বৃদ্ধ এক ধ্যানী তাপস। অতলান্ত তাঁর জ্ঞান। বিস্ময়াবিষ্ট তাইমুর বুঝলেন জ্ঞানের এ মহাসাগর পাড়ি দেয়া তাঁর কাজ নয়। জ্ঞানের কত শাখায় যে বুড়োটি বিচরণ করেন তার ইয়ত্তা নেই। খুশী হলেন তাইমুর। মহাবীর যেন নুয়ে পড়লেন। স্তিমিত হলেন তিনি। স্তব্ধ মহাবীর কোলাকুলি করলেন জ্ঞান-বুড়োর সংগে। সম্মানিত করতে চাইলেন। উঁচু শাহী পদ দিতে চাইলেন তাইমুর এ জ্ঞান-বৃদ্ধকে।

জ্ঞান-তাপস সম্মানিত হলেন। কিন্তু সম্মান দিয়ে কি করবেন তিনি! কতো মহা সম্মানই তো জীবনে তিনি পেয়েছেন। এ জ্ঞান-বুড়ো আর সম্মান ও শাহী পদ চান না। জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গিয়েছে তাতো আর কম না।

দামেশ্‌কের মরণ-চিৎকার তিনি শুনতে চাইলেন না। তাইমুরকে জানালেন অনুরোধ। দামেশ্‌ককে রেহাই দেবার অনুরোধ করলেন। উঁচু শাহী পদ তিনি চান না। একট কৌশল ক'রে জানিয়ে দিলেন তাইমুরকে। তাইমুরের অধীনে উঁচু পদে ঝুঁকি অনেক। তিনি জানেন।

তাতার বীর নাখোশ হলেন না তবু। জ্ঞান-বুড়োর বিপুল জ্ঞান তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

এ বৃদ্ধের জীবনে আর কিছু চাওয়া পাওয়া নেই। কেউ তো আর তাঁর নেই দুনিয়ায়! সবই তো হারিয়েছেন!

শুধু দামেশ্‌কবাসীরা রক্ষা পেলেই তিনি খুশী।

জ্ঞান-বুড়োর সাথে কোলাকুলি করলেন তাতার-বীর তাইমুর লঙ্। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে এ জ্ঞান-বৃদ্ধও আলিংগন করলেন তাইমুরকে।

এক মহা-জ্ঞানীর কাছে পরাজয় বরণ করলেন মহাবীর। জ্ঞান মানুষকে কি না দেয়! তাইতো বলি, তোমরাও বলো: আল্লাহ্ জ্ঞান দাও।

রক্ষা পেলো দামেশ্‌ক। রক্ষা পেলো কত জ্ঞানী-গুণী। রূপ কথার নগরী বাগদাদের মতো হলো না দামেশ্‌কের অবস্থা। কিছু লুটপাট মাত্র হয়েছে। লাখো মানুষের চাইতে এ সব হীরা-জহরত-পান্না আর বেশী কি!

তাইমুরের তলোয়ার কারো ঘাড়েই পড়লো না। তাইমুর সামনে এগিয়ে গেলেন। তস্‌নস্ হলো না কিছুই।

জ্ঞান-বুড়ো বাঁচালেন সবাইকে। সম্মানিত হ'লো মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা। তলোয়ারের চাইতেও ধারালো জ্ঞানের অধিকারী এ মহাপুরুষ কে? তোমরা বলতে পারো?

ইনিই বিশ্ব-বিখ্যাত জ্ঞান-তাপস ইবনে খালদুন। জগত জোড়া তাঁর খ্যাতি। তাঁর জ্ঞান কতো গভীর, তোমরা বড়ো হয়ে যতোই পড়বে ততোই অবাক হবে। জ্ঞানের কোন্ বিষয়ে তাঁর হাত নেই? সব শাখায় সব বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান।

তিনি রাজপুত্তুর নন। ঘোড়া ছুটিয়ে শাহ্‌যাদী জয় ক'রে আনেননি। কিন্তু ছুটেছেন তো ছুটেছেনই। জ্ঞান-অন্বেষায় সারা-জীবনটাই তাঁর কেবলি ছুটাছুটি। কতো জায়গায় গিয়েছেন!

আজ এ রাজধানী। কাল আবার অন্য আর-একটি রাজধানী। আজকে এক বাদশাহ্‌র দরবার। কালকে আর এক বাদশাহের দরবারে। এ জ্ঞানই আবার তাঁর জন্যে সৃষ্টি করেছে দুশমন। জ্ঞানই তাঁর একমাত্র আকাংখা। জ্ঞানের জন্যেই তিনি চলছেন। ভিন্‌দেশে গিয়েছেন, আবার ফিরেছেন।

গাঁজাখুরি গল্প তিনি লেখেননি। অবাক কাণ্ড তাঁর লেখাগুলিতে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। খুঁটিনাটি সবই লিখেছেন মানুষকে নিয়ে। হয়েছেন তিনি বারবার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী না হয়ে হয়েছেন একজন চিন্তাবিদ। মানুষকে তিনি শূলে চড়াতে চাননি। তিনি মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছেন। গদি হারিয়েছেন। গদি পেয়েছেন নতুন করে। উজীর-নাজীর কোতোয়াল পাত্র-মিত্র আমির-উমরাহেরা তাঁর সম্মানে হিংসায় জ্ব'লে-পুড়ে

মরেছে। এতো নাম-ধাম ইবনে খালদুনের তারা সহ্য করতে পারতো না।

ওরা কি ক'রে ইবনে খালদুনকে ঘায়েল করা যাবে দিনরাত সে চিন্তায় থাকতো। শুধু ফিসফাস আর গুজগাজ। মওতের মুখামুখি হয়েছেন বারবার ইবনে খালদুন। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন। কতোবার ঝুঁকি নিতে হয়েছে। কতো রাজধানীর ঝড় তিনি দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হারিয়েছেন পরিজন। কত যে অভিজ্ঞতা বলে শেষ করা যাবে না। সব দাদীর ঝুলিতে জমা হ'য়ে থাকবার মতো। কতো পড়েছেন। কিতাবের পর কিতাব। ঝড়-ঝাপটার মধ্যে যেখানে বসেছেন শুধু কিতাব পড়েছেন। কিতাব লিখেছেন। কতো যে তাঁর সঞ্চয়। কতো যে লেখালেখি।

বিচিত্র চরিত্রের এক মহানায়ক ইবনে খালদুন। সব কিছু তাঁর একেবারে খাঁটি।

কতো তাঁর লেখা। তোমাদের সম্পর্কে, তোমাদের জন্যেও লিখেছেন তিনি। বুড়োরাও বাদ যায়নি।

একটি নাম

এ গল্পেরই মহানায়ক ইবনে খালদুন। নামটা সুন্দর। তাই না? কিন্তু পুরা নামটা কি তোমরা মনে রাখতে পারবে? বিরাট লম্বা নাম।

তাঁর পুরো নাম ওয়ালী উদদীন আবদুর রহমান বিন মুহম্মদ বিন মুহম্মদ বিন মুহম্মদ বিন হাসান বিন জাবীর বিন মুহম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন আবদুর রহমান ইবনে খালদুন।

কি, মনে থাকবে? চেষ্টা করে দেখো, মনে রাখতে পারো কিনা।

ইতিহাসের ব্যাখ্যান

শহরে যারা বাস করে, তাদের নিয়ে তাঁর লেখা। গাঁ গঞ্জের মানুষকে নিয়ে তাঁর লেখা। গা-গঞ্জের মানুষ প্রাণবন্ত

হয়েছে তাঁর অমর লেখনীতে। তাঁর রচনা, তাঁর লেখা সব কিছুতেই রয়েছে সাধারণ মানুষের সব কথা। সব কাহিনী। তাদের ভাষা তাদের চলা-ফেরা তাদের আশা-আকাংখা, সব কিছুই।

জীবনের ঘানি টেনে-টেনে শহরের মানুষ মেশিনের মতো হয়ে গেছে। মেশিনের তেল ফুরিয়ে গেলে চলে না। মেকি সব-কিছুর উপরেই ইবনে খালদুন সাদা-মাটা সোজা কথা শুনিয়েছেন।

তোমরা ভাবো ইতিহাস বুঝি শুধু মরা মানুষের কথা বলে! ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশাহ্‌র কাহিনী! জঙ্গ ও জঙ্গী বাহিনীর মুলাকাত, যুদ্ধের ময়দান! পানিপথ আর পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধের মতো!

ইতিহাস সম্পর্কে এ ধারণাই প্রচলিত। ইবনে খালদুনের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর নতুন ব্যাখ্যা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তিনি পাল্‌টে দিলেন আগের সব ধারণা। আগের সব মত। সব কথা। নতুন কথা বললেন তিনি।

ইতিহাস শুধু ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ যাত্রা নয়। শুধু নতুন নতুন রাজ্য জয় নয়।

আরেকটু ভাবো, আমরা মানুষ তো একা থাকতে পারি না। গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পাড়ায় থাকি। সমাজে থাকি। একটি দেশে থাকি। সমগ্র বিশ্বে থাকি। কারণ সমগ্র বিশ্বেই তো মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মানব সভ্যতার কথা মানব সমাজের ওঠা-নামা নিয়েই আমাদের জন্ম-বৃত্তান্ত। এ সবের লিপিই ইতিহাস। মানব সভ্যতার ক্রমাগত চলমান কথাই ইতিহাস। গতি ও প্রগতির জের। প্রতিক্রিয়াশীলদের পিছু টান। বর্বর থেকে সভ্য হওয়ার উন্মেষে যে গতি সেটাই সভ্যতা।

এ ইতিহাসের রূপকার ইবনে খালদুন। এককভাবে ইবনে খালদুন এ ইতিহাসের দাড়ি-পাল্লায় মানুষের বিচার করেছেন।

ইতিহাস ও মানুষ সম্পর্কে একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছেন ইবনে খালদুন। তাঁর আগে কিন্তু কেউ এ ধারণা দেয় নি।

আজ কাল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা তোমরা শুনছো। কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে এটা একটি বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণের জন্ম দিয়েছেন কে বলো তো ? ইবনে খালদুন। অথচ তোমরা শুনে থাকো, আর পত্র-পত্রিকায় যাদের নাম দেখো,—যেমন কার্ল মার্কস, লেনিন, বার্গস ও হোচিমিনের—তাঁরা কিন্তু সবাই মূল গ্রহণ করেছেন ইবনে খালদুন থেকে। নতুন কিছু নয়। তাঁরা ইবনে খালদুনের রূপরেখায় কাজ করেছেন। তাঁদের পথপ্রদর্শক ও পূর্ব-সূরী ইবনে খালদুন।

মানুষের সংগ্রাম শুধু গায়ের জোরে হয় না। বিদ্যার জোরও লাগে। যে-বইটিতে ইবনে খালদুন এসব কথা লিখেছেন, তার নাম কি জানো ? "বিশ্ব-ইতিহাসের মুখবন্ধ" এর নাম। ইংরেজীতে এর নাম "Prolegomena"। আরবীতে "মুকাদ্দীমা"। আরবীতেই মূল বইটি রচনা করেন ইব্নে খালদুন। আরবীই ছিলো তখন পৃথিবীর সব চাইতে বেশী জনপ্রিয় ভাষা। তোমরা শুনে অবাক হবে, এক সময়ে, বিশেষ করে মুসলমানদের সোনালী দিনগুলিতে পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোকই আরবী বুঝতো, কথা-বার্তা বলতো। বারোশো আটান্ন ইসায়ীতে হালাকু খান যখন বাগদাদ নগরী তস্‌নস্ ক'রে দেন তখন সভ্য পৃথিবীর অর্ধেক লোকের ভাষাই ছিলো আরবী। সে যাই হোক, মুকাদ্দীমা-র ইংরেজী অনুবাদ করেন ইংরেজী পণ্ডিত রোজেনথল। তোমরা বড় হয়ে কিন্তু মুকাদ্দীমা পড়বে। বাংলায়ও মুকাদ্দীমা-র সংক্ষিপ্ত আলোচনা বেরিয়েছে। ইতিহাস, সভ্যতা ও সমাজ বিশ্লেষণ সম্পর্কে ইবনে খালদুনের লেখাটাই প্রথম, মৌলিক এবং অনবদ্য।

জ্ঞানের এ রাজপুত্র এ শাহযাদা মানুষের সারিতেই থেকেছেন, মানুষের কাতার তাঁর ঠিকানা। ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি যাননি শাহী মহলে, পৎথীরাজের কল্পনার রাজ্যে। তিনি মানুষকে কাতার বদ্ধ করেছেন। সাজিয়েছেন মিছিলের পর মিছিলে।

সবই জানা যাবে তাঁর "মুকাদ্দীমা" কিতাবে। বইটি লিখ্‌তে ইবনে খালদুনের মোট চার বছর লেগেছিলো। বইটি ওরানের কালাহ্ ইবনে সালামাহ নামক মহলে বসে লিখেছেন তিনি। মহলে বসে মহলের আরাম আয়েসের বিরুদ্ধেই লিখেছেন ইবনে

খালদুন। দিন নেই রাত নেই। খালি পড়া আর লেখা। দুরন্ত পরিশ্রম। কঠোর সাধনা।

ইবনে খালদুন এমনিভাবে হ'য়ে উঠেছেন একটি প্রতিষ্ঠান। মানব-সমাজের জন্যে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। মানুষের জয়গানের একটি তাজা খবর।

দেখা দেখান্তরে

ইবনে খালদুনের ভাণ্ডার দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়েছে। দিনে দিনে সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতা। ঘুরেছেন মরুপ্রান্তরে। কোনো দিন ভরাপেট। আবার কোনো দিন উপাস করেছেন। কোনোদিন পরিবার-পরিজন সহ। কোনো দিন সাথী হারা, আত্মীয়স্বজন-হীন একান্ত নির্জনে। থেকেছেন বেদুইনদের সঙ্গে। ঘুরেছেন তাদের কাফেলায়। জেনেছেন তাদের যাযাবর জীবন। তাদের মুক্ত আনন্দ। চরকির মতো ঘুরেছেন প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে। মুসাফির হয়েছেন কখনো। একান্ত ভাবে একাকী থেকেছেন কতো। শুধু সঙ্গী ছিলো তাঁর কিতাবগুলো। কোনোদিনই কিতাবগুলো ছাড়েননি তিনি। ওরাই তাঁর নিত্য সহচর।

অসীমের সন্ধানে যেন শাহযাদা ঘোড়া ছুটিয়েছেন—লাগামহীন ঘোড়া।

পশ্চিম দিগন্তে গিয়েছেন। দেখা পেয়েছেন নিষ্ঠুর পেড্রোর। পূর্বের হাতছানিতে পেয়েছেন বিশ্ব-ত্রাস তাইমুর লঙের মুলাকাত। অন্যদিকে তাতার, বার্বার আর আফ্রিকার অর্ধ সভ্য মানুষের সহচর হয়েছেন। আবার জাবল আল তারিক বা জিব্রাল্টার পাড়ি। তারিকের পাহাড়। যেখানে দাঁড়িয়ে তারিক স্বপ্ন দেখেছিলেন সমগ্র ইউরোপ বিজয়ের।

ইব্‌নে খালদুন আবার কায়রোর আল-আজহারে থেকেছেন ছাত্র-বেষ্টিত। কোনোবার হয়তো উজির। আবার হয়তো প্রধান বিচারপতি। ফেজ, দামেশ্‌ক্‌, মরক্কো আর আলজেরিয়ার আনাচ-কানাচ যেন তাঁর হাতের মুঠোয় ছিলো।

তোমরা ভাবছো এ কল্পনা। আসলে তা নয়। আরো শুনতে চাও? রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে ইব্‌নে খালদুন। কোনবার হয়তো আমীর, উঁচু শাহী-পদ লাভ করেছেন।

আইনের চুলচেরা হিসাবে পাকা ইব্‌নে খালদুন। শাহী পদ হয়তো হঠাৎ ক'রে হারালেন। ঠিকানা নেই কতোকাল। কোনবার হয়তো সাধারণ মানুষের কাতারে। আবার হয়তো আমীর ওমরাহ্‌, সভাসদ, পাত্র-মিত্র ও পারিষদবেষ্টিত। মহলের কেন্দ্র-বিন্দুতে অবস্থান করছেন। ষড়যন্ত্র—গভীর ষড়যন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে। কতো ঝড়ঝন্‌ঝা। জীবন নিয়ে টানাটানি। আজরাইল বারবার এসেছেন শিয়রে। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন বারবার। বিতাড়িত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। অজ্ঞাতবাস—তাও আছে। ভাগ্যের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়েছেন। ঠিকানা খুঁজছেন বারবার।

পাড়ি জমিয়েছেন এখানে সেখানে। ফিরে এসেছেন উত্তর আফ্রিকায়। মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া আর মরক্কোয়।

অবাক লাগ্‌ছে—না? কিন্তু সবই সত্যি। ক্লান্ত হননি খালদুন। শ্রান্ত পথিকের মতো মুষড়ে পড়েননি তিনি।

মহল ষড়যন্ত্র

তিউনিসিয়া ইব্‌নে খালদুনের জন্মভূমি। তবে তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ কিন্তু স্পেনের অধিবাসী। স্পেনের মুসলমানদের জীবনে যখন দুঃখের কালো রাত, তখনই তাঁর পূর্ব-পুরুষরা স্পেনের সেভিল নগর থেকে উত্তর আফ্রিকায় চ'লে আসেন। তাঁর বংশের অনেকেই জ্ঞানী-গুণী ছিলেন। শাহী-পদে আসীন ছিলেন অনেকে। তাঁর দাদা ছিলেন তিউনিসিয়ার অর্থ-উজির। আব্বা ছিলেন প্রশাসনিক উঁচু শাহী-পদে। আবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। পরে অবিশ্যি তিনি শাহী-পদের প্রতি মোহ হারিয়ে ফেলেন। শুধু জ্ঞানচর্চায় মনোযোগী হন। আইন ও ধর্ম বিষয়ে মহা পণ্ডিত হন। পিতার এ ধারাতেই ইব্‌নে খালদুন অনুপ্রেরণা লাভ করেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতম সন্তান তিনি।

আল্লাহ জ্ঞান দাও। পবিত্র কুরআনের মহান বাণী দিয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু। এ জ্ঞানের সন্ধানেই তিনি সারাজীবন ব্যাপৃত রেখেছেন। গিয়েছেন যত্রতত্র। রোদের তাপ আর শীতের কাপড় কোনটাই তাঁকে জ্ঞানের পথ থেকে সরাতে পারেনি।

কুরআনের শিক্ষা দিয়ে তার জীবন শুরু। জ্ঞান দিয়ে তাঁর জীবনকে পরিচালিত করেছেন ছেলেবেলা থেকে। কুরআন তাঁর জীবন। কুরআন তাঁর দর্শন।

কুরআন অধ্যয়ন অনুশীলন ও ব্যাখ্যার সংগে কবিতা চর্চাও করেছেন। শিখেছেন ভাষা। ব্যাকরণের খুঁটি-নাটি। ছন্দ-প্রকরণের প্রকার-ভেদ। বিচার করেছেন আইনের সকল বিষয়, প্রয়োগ ও যথার্থতা। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আইনের চুল-চেরা হিসাব করেছেন। ইতিহাস, গতি ও প্রগতি, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-দর্শন, মানব-বিজ্ঞান কোনটিই কি তিনি বাদ দিয়েছেন? না, কোনোটিই বাদ দেননি। কিতাবের পর কিতাব শেষ করেছেন। আরো কিতাবের চাহিদা। আঠারো বছরের উষালগ্নেই তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। প্রসারিত হয় তাঁর জ্ঞানের সব ধারা। ফলে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন জ্ঞানের জগতে। আঠারোর কোঠা ছাড়াননি তিনি তখন।

জীবন-বোধের কঠিন জিজ্ঞাসাই তাঁকে দিয়েছে ন্যায়নিষ্ঠতা ও পরিমিত জ্ঞান। এ জীবনবোধই তাঁকে মহান-ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার করেছে। সভাসদরা মিথ্যা কলঙ্ক ছড়িয়েছে। হিংসুটেরা কাদা ছোড়াছুড়ি করেছে। খালদুন তবু এগিয়ে গিয়েছেন। জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করেছেন।

বিশ বছর বয়সেই তাঁর জ্ঞান তাঁকে দিলো সম্মান। তিনি লাভ করলেন তিউনিসিয়ার সুলতানের সচিবের লোভনীয় পদ। এ যুবা বয়সেই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তিউ-নিসিয়ার সুলতান তখন দ্বিতীয় আবু ইসহাক।

কিন্তু দূরের হাতছানি যাকে অহরহ ডাক দেয় সে আর কাছে থাক্‌বে কি ক'রে? উত্তর আফ্রিকায় তখন আল-মুহ্‌হাদিন বংশের পতন ঘটেছে। গৃহ-যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলো। এক নাজুক অবস্থা।

আমীর ওমরাহ্‌দের কলহ। হিংসা-বিদ্বেষ। সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর গুমোট ভাব। মহল-ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। রক্তে লালে-লাল হ'য়ে যেতে লাগলো। বন্দী হলেন খালদুন।

তাঁর জীবনে পরিবর্তনের সূচনাতেই এ রক্তপাত। তাঁর জীবনে পরিবর্তন তাঁকে কোনো নতুন স্বাদ দিতে পারেনি। মরক্কোতে তিনি এসেছিলেন এবং ফেজের সুলতান আবু ইনানের অধীনে রাষ্ট্র-সচিবের শাহী-পদ গ্রহণ করেন। তারপরই রক্তের কাহিনী।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত খালদুন তখন। কারাগারে নির্জন-বাস। তবু তাঁর জ্ঞান চর্চাকে জেলখানা বাধা দিয়ে রাখতে পারলো না। সুলতানের নেক্‌-নজর থেকে বঞ্চিত হলেন।

মুক্তির স্বাদ পেলেন দুবছর কারাবাসের পর। ভাগ্য বুঝি মুচ্‌কি হাসলো। হারালেন এসময় তাঁর ভাইকে। তিলমিসানের আমিরের হুকুমে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। জীবনের শুরুতেই হারালেন প্রাণ-প্রিয় ভাইকে। হারালেন শাহী-পদ। কিন্তু ইবনে খালদুন টলেননি, টলবার পাত্র তো তিনি নন।

তাহ'লে বুঝে দেখো, কতো তাঁর মনের জোর। এ মনের বল না-থাকলে কি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়?

তারপর তিনি পাড়ি জমালেন স্পেনে। তাঁর পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি। আন্দালুসিয়ার কথা তিনি ভুলতে পারেননি। এলেন গ্রানাডায়। গ্রানাডার আল-হামরা। তোমরা জেনে নিও আল-হামরার কিস্‌সা। মুসলমানদের কীর্তি কাহিনী। গ্রানাডাকে কি ভুলতে পারি আমরা? ভোলা যায় না। কেন ভোলা যায় না বড়ো হ'য়ে জানতে পারবে তোমরা।

তার আগের ঘটনা আরো করুণ। ইবনে খালদুনের বয়স আঠারো বছর। জ্ঞানের কঠিন সাধনায় তিনি নিয়োজিত। তখনই এলো তাঁর জীবনের অমানিশা। সমগ্র দেশের বুকে দুর্যোগের কালোরাত।

সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তখন ক্ষুদে ক্ষুদে রাজ্যে বিভক্ত। তার মধ্যে তিলমিসান, ফেজ ও তিউনিস ছিলো উল্লেখযোগ্য।

তিউনিসে মহামারী-রূপে দেখা দিলো ভয়াবহ প্লেগ। হাজার হাজার মানুষ ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। চারদিকে কান্নার রোল। কারোরই কারো দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। মৃতদেহের দাফন-কাফন তো দূরের কথা। রাস্তা-ঘাটে মরা মানুষের স্তূপ। বিষাক্ত আবহাওয়া। এ ভয়াবহ প্লেগের শিকার হয়েছিলেন ইব্নে খালদুনের আব্বা আম্মা। মৃত্যু ডেকে নিয়ে গেলো তাঁর উস্তাদ ও নিত্যদিনের সহচরদের। আঠারো বছরেই এতিম হ'য়ে গেলেন। বিশ বছর বয়সে আবার ভাইকে হারালেন। কিন্তু মুষড়ে যাননি ইব্নে খালদুন।

সাহসে বুক বাঁধলেন চার ভাইকে নিয়ে। ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে গেলেন মহামারীর হাত থেকে। খালদুন সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন তাঁর চার ভাই মোহাম্মদ, ওমর, ইছা ও ইয়াহিয়ার মধ্যে।

তাঁর এক ভাইকে ছিনিয়ে নিলো তিলমিসানের আমির। ঝাঁঝরা করে দিলো ইবনে খালদুনের বুক। মহামারী যাকে গ্রাস করেনি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা।

বেড়াজাল এরকমই।

এসময়েই আবার তাঁর বিয়েও হয়।

জীবনের এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে পাড়ি জমিয়েছেন ইবনে খালদুন। স্পেন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, সিরিয়া ও মিসরের প্রান্তরে প্রান্তরে তাঁর ঠিকানা। কোথাও উজীর। আবার হয়তো-বা কোথাও সচিব। কোনো সময়ে জিব্রাল্টার বা জবল আল তারিক পাড়ি। কতোবার এ পাড়ি তাঁকে মহাদেশের সীমানায় নিয়ে গেছে তা তোমরা বড়ো হ'লে জানতে পারবে। আজ হয়তো জায়গীরের মালিক। কোনোদিন হয়তো দেখছো কাস্তিলের নিষ্ঠুর পেড্রোর দরবারে রাজদূত হিসাবে।

যেখানেই তিনি গিয়েছেন ষড়যন্ত্র তাঁর পেছনে ধাওয়া করেছে। স্পেনে গ্রানাডার সুলতান তাঁকে রাজদূত ক'রে পাঠান কাস্তিল ও লিয়নের রাজা নিষ্ঠুর পেড্রোর রাজ-দরবারে। সেখানেও তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের নিবাস সেভিলে

বাস করতেন পেড্রো, সেভিলে তিনি শান্তি পেতে চেয়েছেন। রোমন্থন করেছেন পূর্বপুরুষদের স্মৃতি। সপরিবারে থাকতে লাগলেন সেভিলে। কিন্তু কপালে যার সুখ নেই তার আন্দালুসিয়ায় থাকা কি করে সম্ভব? আবার ভাগ্য বিড়ম্বনা। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।

আন্দালুসিয়া খালদুনকে দিয়েছে অনেক কিছু। এতো সব ঝামেলার মধ্যেও তিনি জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসু মন যখনই সুযোগ পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করেছে। স্পেন হয়েছে তার অভিজ্ঞতার বিরাট ক্ষেত্র।

ভাগ্য বিড়ম্বিত খালদুন আবার ফিরে এলেন সপরিবারে উত্তর আফ্রিকায়। তারপর বগির আমিরের উজির হলেন। আমির আবু আবদুল্লাহ বেশ খাতির যত্নই করতে লাগলেন। আমিরের সঙ্গে হঠাৎ তার ভাই আবুল আব্বাসের ঝগড়া বাধে। এক যুদ্ধে নিহত হন তিনি। ভাগ্য আবার ইবনে খালদুনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দ্যায়। আবার তাঁর জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত। আমির আব্বাসের কবল থেকে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচালেন ইবনে খালদুন।

আশ্রয় লাভ করলেন ইবনে খালদুন মরক্কোতে। তিলমিসানের আমির তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দেন। কিন্তু ইবনে খালদুন বন্দী হন মরক্কোর সুলতান আবদুল আজিজ ইবনে আল হাসানের হাতে। কারণ মরক্কোর সুলতান হঠাৎ ক'রে তিলমিসান দখল করে নেন। কিন্তু বন্দিত্ব বেশিদিন থাকলো না। মরক্কোর সুলতান বুঝলেন খালদুন এক অনন্য-সাধারণ প্রতিভা। ইবনে খালদুন আবার পেলেন মর্যাদা শাহী দরবারে। দিন বেশ কাটতে লাগলো। কিন্তু আবার দুর্যোগের ঘনঘটা। প্রতিপক্ষ আরেক সুলতানের নিকট পরাজিত হলেন মরক্কোর সুলতান। আবার খালদুনের বন্দী জীবন যাপন। নির্জন কারাগার যন্ত্রণা। শুধু কিতাবগুলো সম্বল। লিখতে থাকলেন। পড়তে থাকলেন।

আবারও মুক্তি। পৃথিবীর আলো-বাতাসে আবার বেরিয়ে এলেন খালদুন।

ঘটনার পুনরাবৃত্তি

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথা বলেছেন ইবনে খালদুন। ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁর জীবনে বারবার ঘটেছে। খালদুন নিজেই পুনরাবৃত্তির ইতিহাস। কতো ঘাটের পানি খেয়েছেন খালদুন তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?

আবার আন্দালুসিয়া। আবার স্বদেশ তিউনিসিয়া। বারবার জায়গা বদল। বারবার সুখের আশা।

তাঁর স্বদেশ তিউনিসিয়া। অনেকে তাঁর দেশ-প্রেম নিয়ে কথা তোলেন। কিন্তু সে কি ঠিক, তোমরাই বলো? ষড়যন্ত্র কি কোথাও তাঁকে টিক্‌তে দিয়েছে? তিউনিসিয়া তাঁর মনে ছিলো, ধ্যানে ছিলো। কিন্তু তাঁর মনীষা বারবার শত্রু সৃষ্টি করেছে। নিজ দেশ তিউনিসিয়ায় তাঁকে টিক্‌তে দেয়া হয়নি। জ্ঞানী ও সুধী সমাজ তাঁর বিপুল যশ ও পণ্ডিতকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। হিংসা করেছে। গুমোট আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। তাঁর জন-প্রিয়তা তাঁকে দিয়েছে শত্রুর ষড়যন্ত্র। কট্টর রাজনীতিবিদ্‌দের চোখের বালি হয়েছেন খালদুন। আর এমনিভাবে তিনি শিকার হয়েছেন ষড়যন্ত্রের।

তিউনিসকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম তিউনিসিয়া। আব্বা আম্মা আত্মীয় পরিজন সবাইকেই তো তিনি হারিয়েছেন।

যেখানেই গিয়েছেন দেশের নাড়ীর স্পন্দন যেন তিনি অনুভব করেছেন। মিশেছেন অবাধে, মানুষের সঙ্গে। বেদুইন বর্বর এবং সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে। বিচিত্র তাঁর মান-সিকতা। সজাগ তাঁর অনুভূতি। সে-অনুভূতিই তাঁর অতলান্ত প্রতিভার স্বাক্ষর। সেভিলের আনন্দ, আলজিরিয়ার উজীর এবং তিউনিস, মরক্কো ও আন্দালুসিয়ার কোনো শাহী পদ তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। অবলীলায় ছেড়েছেন উঁচু আসন। সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি নিজের মনে জীবনের সকল অলিন্দে। আর সদর রাস্তাকেই মনে করেছেন নিজের আস্তানা।

লোকে তাঁকে ভালোবাসতো। মানুষের ভালোবাসা কুড়োতে গিয়েই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয়তার মূল্য তিনি কিভাবে পেয়েছেন, তার একটি গল্প শুনতে চাও? শোনো।

একবার নিরাশ্রিত ইবনে খালদুন ঘুরছেন নয়া ঠাঁইয়ের জন্যে। হঠাৎ সুযোগ এসে গেলো। এবার তিনি জায়গা পেলেন তিলমিসানের আমিরের দরবারে। আমির তাঁকে যথেষ্ট ইজ্জত করলেন। বেশ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তাঁকে। শাহী-দরবারে তাঁর স্থান হলো।

ইব্‌নে খালদুন মিশুক লোক। তিলমিসানের গরীব, মেহনতি ও নিচু তলার মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা শুরু হলো। তাদের জীবনবোধ তাঁর জানা প্রয়োজন। তাদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

আমির ভুল বুঝলেন জ্ঞানী-প্রবরকে। ভুল বোঝালেন পাত্র-মিত্রগণ। ফলে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হ'লো। শাসক-গোষ্ঠী সব সময়েই সন্দেহপ্রবণ হ'য়ে থাকে। এ মেলামেশা তিলমিসানের আমিরের সহ্য হয়নি। অথচ ইবনে খালদুন স্বাভাবিক জ্ঞান-স্পৃহার খাতিরেই মেলামেশা করতেন। আমিরের বিরুদ্ধে প্রজাদের লেলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে ইবনে খালদুন অভিযুক্ত হলেন। আবার ইবনে খালদুন পথকে ঠিকানা করেই বেরিয়ে পড়লেন। এ জন্য তাঁর ভাই ইয়াহিয়াকেও কম মূল্য দিতে হয়নি। জীবন দিয়ে কেটেছেন এক চিরস্থায়ী দাগ।

তারপর আশ্রয় আফ্রিকার মরুভূমির এক খণ্ড রাজ্যের আমিরের কাছে। এ আমির তাঁর জীবনের কিছুটা মোড় ঘোরালেন। ইজ্জত দিলেন। মহব্বত করলেন ইবনে খালদুনকে। শাহী মহলে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। কালাহ্ ইবনে সালামাহ্ নামক মহলে সুখ-শান্তিতে কাটালেন চার বছর। রচিত হলো তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ "ইতিহাসের মুখবন্ধ" বা "মুকাদ্দীমা।"

তারপর ফিরে গেলেন তিউনিসে। ইচ্ছা, বাকী জীবন কাটাবেন প্রাণপ্রিয় জন্মভূমিতে। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি মানুষের পূরণ হয়? আমাদের মহানবীকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। ভাগ্যের

অন্বেষণে বাবুরকে ঘুরতে হয়েছে সমরকন্দ, বোখারা, ফারগানা, কাবুল ও কান্দাহারের পথে প্রান্তরে। ভাগ্যহত বাবর এলেন এ উপমহাদেশে। পত্তন করলেন মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত। নিজ দেশ থেকে শাহী ষড়যন্ত্রই তাকে বিতাড়িত করেছে।

বাবুর কিন্তু রাজ্য-জয় করেছেন। বিজয়ী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ইতিহাস খ্যাত শাহেনশাহ্ হিসাবে। এর বেশী কিছু নয়।

ইবনে খালদুন? না, তিনি সম্রাট হ'তে চাননি। তিনি সাধারণ মানুষের ইতিহাস রচনা করেছেন। শাহী-তখ্ত, রাজা বাদশাহ্র যুদ্ধজয় ও হত্যাকাণ্ডের কাহিনী তাঁর ইতিহাস নয়। তাঁর ইতিহাস মানব সমাজের বিবর্তনের প্রবহমান গতিধারা। শ্রেণী সংগ্রাম ও আলোড়নের টানাপোড়েন-ধন্য ইতিহাস।

ইবনে খালদুন নিজদেশ তিউনিসে এলেন। কিন্তু টিক্তে পারলেন না। তাঁর দেশ তাঁকে বুঝতে পারেনি। তিনি জ্ঞানী মহলে আলোকপাত করতে চাইলেন তাঁর চিন্তা-ধারা। যশ, নাম ও ইজ্জত তাঁর হ'লো। দুরূহ বিষয় তিনি আলোচনা করলেন। ভাষণের পর ভাষণ দিতে লাগলেন সুধী-সমাজে। কিন্তু হিংসা ও ষড়যন্ত্রের সব জায়গাতেই যদি ধাওয়া করে তাহলে তাঁর কপালে শান্তি কোথায়? পরিণামে দেশও আবার তাঁকে ছাড়তে হলো।

বীতশ্রদ্ধ হলেন ইবনে খালদুন। যদিও দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর পাণ্ডিত্য ও গভীর চিন্তার কথা। একটু ক্লান্তি যেন বোধ করলেন তিনি। মনের উপর ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। তাঁর বক্তব্য ও লেখনী অবশ্য থামেনি।

এবার কি করবেন তিনি? হ্যাঁ, তাকে একবার হজ্জে যেতে হবে। পবিত্র কাবা-গৃহের ডাক। যেই কথা সেই কাজ। ছুট-লেন। তিউনিস-প্রাণপ্রিয় তিউনিসবাসীদের ছেড়ে তাঁর নতুন যাত্রা।

যাত্রা-বিরতি হ'লো কায়রোতে এসে। কায়রো—সুন্দর নগরী কায়রো। মিশরের মামলুক সুলতান মহাসমাদরে খোশ আমদেদ জানালেন ইবনে খালদুনকে। মহাজ্ঞানী যাত্রা বিরতিতে অভিভূত হলেন।

মামলুক সুলতান চাইলেন ইবনে খালদুনকে। সেবার আর হজ্জে যাওয়া হলো না।

ফেরাউন বাদশাহ্‌দের মিশর। ইতিহাসে রূপকথার দেশ মিশর। নীল-নদের দেশ মিশর। মিশরের পিরামিড আর মমি। প্রাচীন যুগের আশ্চর্য। আদি অনন্ত কালের দেশ মিশর।

ইবনে খালদুনকে দেখতে হবে। তাঁকে থামতে হলো এ লীলা-ভূমির মোহে। প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশর ইবনে খালদুনের অমর সৃষ্টিগুলোতে উপাদান যুগিয়েছে।

মিশরে আগে থেকেই ইবনে খালদুনের পরিচিতি ছিলো। জ্ঞানের দিক্‌পাল হিসাবে তাঁর খ্যাতি আগেই মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সুলতান তাঁকে কায়রোর প্রসিদ্ধ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব দিলেন। আল-আজহার সম্পর্কে তোমরা বড়ো হলে জানতে পারবে। বর্তমান মিশরেরও রাজধানী কায়রো। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কায়রোর এ জৌলুশ কিন্তু বহু আগে থেকেই।

এ কায়রোতেই ইবনে খালদুন জীবনের শেষ চব্বিশটি বছর কাটিয়েছেন। কায়রোতে যখন আসেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। জ্ঞানসাধনার কয়েক যুগ তখন তিনি কাটিয়েছেন। কেতাবের পর কেতাব লিখেছেন। খ্যাতির তুঙ্গে তিনি। কয়েক দশকের তিক্ততা ও আর অভিজ্ঞতার ঝুড়ি তখন তাঁর কপালের কুঞ্চিত রেখায়।

স্বপ্ন নগরী কায়রোতে

জ্ঞানের মশাল জ্বালাতে চাইলেন ইব্‌নে খালদুন কায়রোতে। তাঁর বিগত পঞ্চাশটা বছর কেটেছে টানা-হেঁচড়ায়। ছুটোছুটিতে। কায়রো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইবনে খালদুন। দীপ্তিমান ভাস্বর ধ্যানী। গভীর সাধনায় মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন তিনি। জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ যেন পেলেন জীবনের স্বাদ।

শুরু করলেন এক-জীবন। সাধনার একটি সংগ্রাম। হাত-ছানি অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখায়। সূক্ষ্ম তাঁর বিচার। তীক্ষ্ণ

তাঁর লেখনী। জ্ঞান পিপাসু মানুষ শিক্ষার্থী, সুধী ও বিজ্ঞজন তাঁর চারপাশে ভিড় জমালো। ঘিরে রাখলো তাঁকে।

জ্ঞানের কোন্ বিষয় জানতে চাও? ইতিহাস? না, শুধু ইতিহাসই নয়। মিশরবাসী ও দূর দেশাগত জ্ঞানার্থী বিজ্ঞজন দেখলো আইনের চুল-চেরা হিসাবে তাঁর জুড়ি নেই। পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা কেউ তো তাঁর মতো দিতে পারেন নি। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সব কিছুতেই তাঁর সমান দখল। মৌলিক প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতে সাবলীল। অভিনব ও ক্ষুরধার যুক্তি তাঁর বক্তব্যে। ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা। কায়রো আল-আজহারে তিনি যেন প্রদীপ্ত সূর্য। তাঁর চারদিক ঘিরে যেন গুঞ্জরণের শিহরণ। মশাল যেন পৃথিবীকে আলো দেখাতে চায়।

প্রদীপ্ত সূর্য ইবনে খালদুন যেন এক ধ্যানে নিমগ্ন।

তাঁর ব্যাখ্যা ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আল-আজহারে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। জ্ঞানের জগতে এ আলোড়ন যেন একটি আন্দোলন। এটি নতুন ধারা। তাঁর ধ্যান ধারণা সুধী সমাজে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করলো। দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়লো ইবনে খালদুনের নাম।

তাঁর বাড়ীতেও জ্ঞানার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করলো। রচনা শুরু করলেন তাঁর কেতাবগুলো। সমকালীন বিশ্বে শুরু হ'লো এক কৌতূহল। তাঁর বাড়ীর আঙিনা পরিণত হ'লো এক মহা-শিক্ষালয়ে।

কায়রো রূপ-কথার কায়রো নগরী হলো তাঁর জ্ঞান-কেন্দ্র।

এ কায়রোতে ঘিরে তাঁর জীবনের শেষ চব্বিশটি বছর কাটলো।

রাজনীতির নয়া উন্মেষ ঘটালেন তিনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর অর্থনীতির নতুন অঙ্গন তাঁর। পবিত্র কুরআনের মৌলিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। মানব সমাজের এক নতুন ভিত্তি স্থাপন করলেন তিনি। মানুষের জন্য আলাদা কাঠামো। আলাদা খবর। তরতাজা নতুন সংবাদ। রচনা করলেন চলার পথের দিশা।

দূর দূরান্তের মনীষীরা ছুটে আসতে লাগলেন ইবনে খালদুনের নিকট। অধ্যাপনায় তিনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন। নতুন শিক্ষার্থীরা জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পেলেন ইবনে খালদুনের মধ্যে। সময় ব'য়ে যেতে লাগলো। কর্ম-ক্লান্তি নেই। বিরক্তি নেই ইবনে খালদুনের। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙেনি ইবনে খালদুনের। ঝড়-ঝাপ্টা যাই থাক্—ইবনে খালদুনের গতি সামনে। ব্যাখ্যা দিলেন মানব-সমাজের গতি ও প্রগতির ধারার। ইতিহাস একটি ব্যাপক অভিজ্ঞতার ময়দান। এ ময়দানের পাত্র-মিত্রগণ মানুষের সর্ব শ্রেণীর কাতারে আসীন। বাস্তব সমীক্ষা ও মূল্যায়নেই ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত। মহত্তর কল্যাণমুখী সামাজিক সুবিচারই এ ইতিহাসের ধারণা দেয়। ইবনে খালদুনের এ ভিত্তি পবিত্র আল-কুরআনকে অবলম্বন ক'রেই প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের এ মজবুত ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা ইব্নে খালদুন—এককভাবে ইবনে খালদুন। আধুনিক ঐতিহাসিক আরনল্ড্ টয়েনবি ইব্নে খালদুনের ধারাতেই কথা বলেছেন। কার্লমার্কসের পুঁজিতেও তাঁরই উপস্থাপনার গতি। জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসাবে ইতিহাস—ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষায় যে-মহতী প্রয়াস—তাঁর দার্শনিক ভিত্তি মানুষের দরবারে তুলে ধরেছেন ইব্নে খালদুন। আগেই বলেছি তোমাদের, ইতিহাস রাজ-রাজড়ার কাহিনী নয়। উজির-নাজির পাইক বরকন্দাজ পেয়াদার চলাফেরা নয়। সেনাপতির বীরত্বও নয়। আমীর ওমরাহদের মহান সেনাপতির বীরত্বও নয়। নট-নটীর অভিনয় তো নয়ই। গোলা-বারুদ আর কামানের কানফাটা আওয়াজও নয়। নগরীর কোতোয়ালের পায়ের আওয়াজ কিংবা পায়ের তাল ইতিহাস নয়। ইতিহাস শুধু সিনাই বা শান্ত্রীর পাহারা আর টহল নয়। জল্লাদের গরদান কীর্ত্তনও নয়। ইতিহাস একটি সমন্বিত বিন্যাস। একটি চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণ। ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। সে-ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হচ্ছে চলমান মানব সমাজ। এখানে মানব সমাজ আন্তর্জাতিক দণ্ডে দণ্ডায়মান। জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ। আলিমের সংগ্রামের ইঙ্গিত। জনতার কুচকাওয়াজ। বাস্তব যুক্তি, সমীক্ষা ও মূল্যায়নের মাপকাঠিতে চরম পরিপক্কতা। মৌলিক

ধ্যান ধারণায় এ মানুষের মিছিল সোচ্চার। এ সোচ্চারিত গোষ্ঠীতে সমাজের সকল স্তরের লোক আছে। আছে মানুষের আর্তনাদ। অত্যাচারীর হুংকার। আমার তোমার চলার পথ। আমাদের জীবন ও সময়ের মূল সুর।

এ ইতিহাসের পাত্র-মিত্র আমরা সবাই। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর আমরা সবাই। এ বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর একটি কাঠামো, একটি বুনিয়াদ। জীবন চির প্রগতিশীল এবং প্রবহমান। বিশ্ব-ইতিহাসের সকল ঘটনা প্রবাহের একটি অখণ্ডিত দলিল।

ইবনে খালদুন তাই রূপকথার রাজপুত্তুর নন। ঘোড়া সাজিয়ে রাজকন্যের জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরেননি। শাহযাদীর জন্যে তিনি রাজ্য জয়ে বের হননি। ঘুরেছেন তিনি মানুষকে জানবার জন্যে। তিনি বই পড়েছেন। জেনেছেন। শুনেছেন। লিখেছেন আর শিখেছেন। শিখবার জন্যে দেশ থেকে দেশে ছুটেছেন আর ছুটেছেন। আব্বা আম্মাকে হারিয়েছেন। ভাইদের হারিয়েছেন। বন্ধুদের খুইয়েছেন। পরিশেষে গিন্নী থেকে শুরু করে পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন। কি করে হারালেন তাও তোমাদের বলছি একটু পরেই।

সব হারিয়ে তিনি কি পেয়েছেন? হ্যাঁ, পেয়েছেন তিনি পৃথিবীর সব মানুষকে। হাহাকার দেখেছেন। মহল ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন। দুঃখ-দুর্দশাকে দেখেছেন। সৈন্যের দাপাদাপি দেখেছেন। দেখেছেন বাদশাহ আমিরের বিলাস। মহলে থেকেছেন। মরু প্রান্তরে ঘুরেছেন। আবার পর্বত সঙ্কুল পথ। বেদুইন ও বার্বারদের দেখেছেন। মুলাকাত করেছেন তাতার বীর তাইমুর লঙের সাথে। আল-আজহারের মহা শিক্ষাঙ্গনের মহামিলন। এতো অভিজ্ঞতা কার আছে বলতে পারো?

জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরেছেন ইবনে খালদুন পথে-প্রান্তরে। পথকে কতবার ঠিকানা করেছেন। তিনি তোমাদের আমাদের জন্যে হীরা জহরত পান্না বা আশরফি রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন অমূল্য স্থান। পবিত্র আল-কুরআনের অমোঘ বাণী—আল্লাহ জ্ঞান দাও।

বড়ো হওয়ার গোপন কথা জানা। এ জানের পথই বাতলে দিয়েছেন ইবনে খালদুন।

ইবনে খালদুনের কায়রো। কায়রোর আল-আজহার তাঁর প্রাণ প্রিয়। জ্ঞানার্থীর ভিড়ে ইবনে খালদুন বেশামাল নন। প্রতি সুধী জ্ঞানার্থী বিজ্ঞজনদের জ্ঞান-পিপাসা তিনি মেটাতে লাগলেন। তাঁর কাছে ভাষণ, বক্তব্য ও বিচার বিশ্লেষণ শুনতে যারা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, আইন-বিদ, ধর্মবেত্তা ও আরো অনেক মশহুর ব্যক্তি। জ্ঞানের দিকপাল সব। তাঁরা তাদের সব জ্ঞান ইবনে খালদুনের নিকট ঝালিয়ে নিতেন। বিশ্ব বিখ্যাত হাফিজ ইবনে হাজর আল-আসকালানী এবং মাকরিজি তাঁর কাছে গ্রহণ করেছেন অনেক ইলেম। তাঁরা হয়েছেন প্রসিদ্ধ। দিক-জোড়া তাঁদের নাম। এক এক ক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করছেন।

ইবনে খালদুনের অমর কেতাবগুলো এ সময়েই রচিত হয়।

ইবনে খালদুনের অধ্যাপনাই ভালো লাগছিলো। এতেই তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। মামলুল সুলতান দেখলেন তাঁর অতলান্ত জ্ঞান। তাঁকে কাজী উত-উল কুজাহ বা প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। ইবনে খালদুনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

কায়রো তাঁকে দিলো শাহী ইজ্জত। প্রধান বিচারপতির ন্যায় দণ্ড তাঁর হাতে এলো।

আদালতে

ন্যায়-বিচার ও আইনের শাসনের প্রবক্তা ইবনে খালদুন। তাতে আমির ওমরাহ কেউই বাদ পড়ে না। ন্যায়ের তুলাদণ্ড ইবনে খালদুন তুলে নিয়েছেন। বাদী বিবাদী ফরিয়াদী আর আসামী সবই আইনের চোখে এক।

ফলে যা হবার তাই হলো। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে কায়েমী স্বার্থ বাদীদের আঁতে ঘা পড়লো। আমির ওমরাহ অমাত্যবর্গ পাত্রমিত্র অনেকের জালিম রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। অনেকেই তাঁর শত্রুতা

শুরু করে দেয়। আবার ফিসফাস। গুজগাজ। কান-কথা। ইন্ধন জোগানো। ইবনে খালদুনের কপালের লিখন কে খণ্ডাতে পারবে?

আবার মহল ষড়যন্ত্র। শাহী মহলের ভোমরারা কল-গুঞ্জন তুললো। মামলুক সুলতানের কানভারী করতে লাগলো। সুলতান তো সন্দেহমনা হয়ে থাকেনই। অভিযোগের পর অভিযোগ। মিথ্যার বেসাতি। এবার প্রধান বিচারপতি ইবনে খালদুন আসামীর কাঠ গড়ায়।

প্রধান বিচারপতি ইবনে খালদুনের বিচারের আয়োজন করলেন মামলুক সুলতান।

চললো সওয়াল-জবাব। ন্যায়ের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ইবনে খালদুন আজ বিচারের মানদণ্ডে কাঠ গড়ায়। বিচারের আসামী জল্লাদের খড়্গ যেন তাঁর গরদান কাটবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

ধীর স্থির ইবনে খালদুন। অভিযোগ খণ্ডাতে লাগলেন তিনি। জ্ঞান-বুড়োর জীবনে এক চরম সময়। ইবনে খালদুনের বিচারে কোনোদিন অন্যায় প্রশ্রয় পায়নি। তিনদেশী ইবনে খালদুন। কি তাঁর অপরাধ? যার ন্যায়ের বিচার সূক্ষ্ম। মানুষের আর্ত হাহাকারে ন্যায়ে বলিষ্ঠ একটি সোচ্চার আওয়াজ ইবনে খালদুন। মজলুম মানুষের ফরিয়াদ যার বুককে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। মামলুক সুলতানের আদালতে তাঁর বিচারের প্রহসন।

সারা কায়রো আকুল। দেখতে চায়, কি হয়।

অভিযোগগুলো প্রমাণ করা গেলো না। পণ্ড হয়ে গেলো সব ষড়যন্ত্র। রায়ে বেকসুর খালাস পেলেন প্রদীপ্ত সূর্য সারথী ইবনে খালদুন।

কিন্তু কতো সহ্য হয়, বলো? আর না। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষটি আর কতো জ্বালাতন সহ্য করবেন? আবার অধ্যাপনা, আবার প্রধান বিচারপতির পদ। কায়রো চব্বিশ বছরের জীবনে বারবার ওলোট-পালোট। কতো টানা পোড়ন। কতো টানা হেঁচড়া কতো হয়রানি। কতো আর সহ্য করা যায়।

আঘাতের পর আঘাত। এর চাইতেও চরম আঘাত তিনি পেয়েছেন। বিরাট ক্ষত তাঁর হৃদয়ে। বড়ো করুণ। পাষাণের চোখেও পানি আসে। তোমাদের তো আসবেই।

তাঁর পরিবারের সবাই জল-পথে আসছিলেন কায়রো। জাহাজে আসছিলেন ওঁরা। কতো আনন্দ ইবনে খালদুনের। গিন্নি সন্তান কতোদিন পরে দেখবেন ওদের। একটি চরম বিপর্যয় ঘটলো। জাহাজ ডুবি। তাঁর সবাইকে নিয়ে জাহাজ ডুবে গিয়েছে। কেউ আর আসতে পারলেন না কায়রো। ওদের তো কিছুই দিতে পারেননি ইবনে খালদুন। ইবনে খালদুনের জীবনে কেউই আর ফিরে এলো না। ইবনে খালদুন—বুড়ো তিনি। সবাইকে নিয়ে থাকবার কামনা বাসনা, সবাই উড়ে চলে গেলো। বেঁচে রইলেন এ বৃদ্ধ জ্ঞান তাপস।

জাহাজডুবি রহস্য-ঘেরা অনাবৃত এক কাহিনী। কেউ জানলো না। কেউ দেখলো না। গভীর রহস্য তোমরা উদঘাটন করবে বড় হয়ে।

ইবনে খালদুন এক বৃদ্ধ। স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটেছেন সারাজীবন। জীবনে অবদান তাঁর অনেক। কিন্তু কি পেলেন তিনি? সব হারাবার আনন্দ।

জগৎ জোড়া তাঁর নাম। এ নাম, এ খ্যাতি অর্জন করতে কি মাশুলই না দিতে হয়েছে ইবনে খালদুনকে।

ইবনে খালদুনের কায়রো তোমরা ঘুরে আসবে না? স্বপ্ন-নগরী কায়রো তাঁর জীবনের শেষ আশ্রয়-স্থল। ঘুমিয়ে আছেন সেখানে ইবনে খালদুন। চুয়াত্তরের বুড়ো কবরে শায়িত। পাঁচশো তিয়াত্তর বছর পরে তোমাদের কাছে তাঁর গল্প করছি। কই তাঁকে তো মানুষ ভোলেনি। আজো তাঁর নাম দর্শনে, মানুষের চিন্তা-ভাবনায়। ইবনে খালদুন এক অজেয় পুরুষ। বিরাট তাঁর অবদান।

আঘাত তাঁকে দিয়েছে জ্ঞানের পথ। এ জ্ঞানের পথেই তিনি সব হারাবার কষ্ট ভুলেছেন।

বহু-অপেক্ষিত হজ্ব সমাপন করলেন ইবনে খালদুন। মহানবীর দেশ পবিত্র মক্কা তাঁকে দিলো সব হারাবার ব্যথা ভুলবার মন্ত্র।

তাইমুরের তরবারি তাঁকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। মানুষ তাঁকে বারবার যন্ত্রণা দিয়েছে। তবু তাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন তাঁর কেতাবগুলো। অমর বাণী। পাঁচশো তিয়াত্তর বছরেও যা মুছে যায়নি। মুছে যাবেও না কোনোদিন।

মামলুক সুলতান আল-মালিক আল-নাসির ভুল বুঝলেন ইবনে খালদুনকে। অথচ ইবনে খালদুনই তাঁকে বাঁচিয়েছেন তাইমুরের তরবারি থেকে।

ইবনে খালদুনের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি কিছু বলেছি। বড়ো হলে আরো জানতে পারবে।

গ্রাম-গঞ্জের মানুষ আমরা তোমরা সবাই অধিকাংশ। গ্রামবাসী আর নগরের অধিবাসীদের মানসিকতার তুলনা করেছেন ইবনে খালদুন।

তোমরা তর্ক করো গ্রাম ভালো না শহর ভালো। সে তো তর্ক। তাতে শহর কোনো সময় ভালো হয়। আবার গ্রামও জিতে যায়। শহর ও গ্রাম সম্পর্কে ইবনে খালদুন নতুন কথা বলেছেন। ভালো কাজের জন্যে গ্রামবাসীরা কিন্তু অনেক অগ্রসর। কারণ তাদের ভালো ও মন্দ কাজ বুঝবার ক্ষমতা সাদামাটা। তাদের মন্দ কাজ করবার মতো ক্ষেত্র নেই। পরিবেশ নেই। গ্রামবাসী-দের চরিত্র সাদাসিদে ও সরল। মন্দের দিকে ঝুঁকবার জন্যে নগরের মতো সুবিধা গ্রাম্য জীবনে নেই। ধরো, ভালো বা মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকে গেলে ওটা তার অভ্যেসে পরিণত হয়। কারণ মানুষ অভ্যেসের দাস। ভালো কাজ করতে থাকলে ভালো কাজ করাই অভ্যেস হ'য়ে যায়। মন্দ কাজ করলে মন্দ কাজ করার স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের মনই সব।

শহর জীবনে ভোগ বিলাস বেশি। আরাম আয়েসের ব্যবস্থা অনেক। প্রাচুর্য ও লোভ তাদের আশাকে ইমারতমুখী করে। পুঁজি গড়তে চায়। আরো বেশি চায়। ফলে নানারকম অসৎ বৃত্তিতে তারা আসক্ত হয়। অন্যায় তাদের ন্যায়-নীতিতে বাধে না। বুদ্ধি থাকার দরুন ফাঁকি ও ঠক্‌বাজি শিখে যায়।

গ্রাম জীবনে মন্দ কাজে আসক্ত হওয়ার সময় নেই। আলোর ঝলকানি আর জৌলুশ নেই। পোষাকের বাহার নেই। নাট্য-

শালা নেই। নেই নেশার জায়গা—জুয়া আর মদের আড্ডা। নেই আরাম-আয়েশ করবার কোনো কিছু। মাটির পথ-ঘাট, মাটির ঘর আর সাদাসিদে জীবন। অতএব শহরবাসীর মতো অন্যায় আর অপরাধ করবার সুযোগ নেই। অন্যায় ভুল হ'য়ে গেলেও তা শুধরে যায়। কারণ অন্যায়টা ধরা পড়ে বেশি।

নগরবাসী থাকে দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে। মুক্ত আলো-বাতাসহীন সব অবস্থা। তারা তাদের জান-মাল হেফাজতের জন্যে নির্ভর করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের উপর। আত্ম নির্ভর না হ'য়ে পর নির্ভর হয় নগরবাসী। তাদের প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় সাহস কম। নাড়ীর স্পন্দন বেশি। বুক খুব ধড়ফড় করে। চাকর-বাকর বেষ্টিত হয়ে কেমন যেন নগরের জৌলুশে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রাণ-খোলা জীবন তাদের পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাদের এসব অভ্যেস হয়ে যায়।

গ্রাম-বাসীগণ শহর থেকে অনেক দূরে থাকে। সভ্যতার সব ছাপ পড়ে শহরে। সৌধ-সভ্যতার সব ছাপ সেখানে। গ্রামে মানুষ নিরাপদে থাকে। তারা নিজেদের জান-মালের হেফাজত নিজেরাই করে। কারণ শান্ত্রী বা পুলিশ তো তাদের কাছে থাকে না। পাহারাদার নেই। পাহারাও মোতায়েন থাকে না। রাত্তিরে বাইরে ঘুমোতে আপত্তি নেই। প্রকৃতি তার অকৃপণ শোভা বিস্তার করে গাঁয়ে-গঞ্জে। গাড়ি নেই। দুর্ঘটনা ঘটে না। ডাকাত পড়লে নিজেরাই রুখে দাঁড়ায়।

গ্রামবাসীদের উদ্যম সতেজ। সভ্যতার প্রবহমান ধারায় শহরবাসীগণ গ্রামবাসীদের উপর চেপে বসে। হাহাকার ওঠে চারদিকে। পরিশেষে প্রতিবাদ ওঠে বাদশাহর জুলুমের বিরুদ্ধে। শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শুরু হয় সংগ্রাম। মানুষের ফরিয়াদ। আর একদিন গ্রামবাসীরা চড়াও হয় নগরবাসীদের উপর। দুর্বল শহরবাসীরা তাদের রুখতে পারে না। তার পতন ঘটবেই। কোনো জাতিই তার উন্নতি ও বিকাশ নিয়ে নব্বই থেকে একশো বিশ বছরের বেশি টিকতে পারে না। একটি মানুষের জীবনে যা ঘটে তাই না।

এ নিয়মেই জাতি ও মানব সমাজের উত্থান পতন চলছে এবং চলতে থাকবে।

গ্রামবাসীদের সম্পর্কে এ চিরন্তন সত্যই প্রকাশ করেছেন ইবনে খালদুন।

মরুভূমির বেদুইন আর গ্রামে-গঞ্জের মানুষই ইবনে খালদুনের মানুষ। এ সত্য জন্ম দিয়েছে নতুন কথা। নতুন সুর। এই নতুন চিন্তার পথ ধরেই এগিয়েছেন কার্ল মার্কস, বার্গসঁ, লেনিন আর হোচিমিনরা। তাহলে আজকে মানুষের যে বুলন্দ আওয়াজ তার মূলে কার অবদান বলো তো? ইবনে খালদুন—হ্যাঁ, ইবনে খালদুনই তাঁর নাম।

সামাজিক বিচারের কথা বারবার বলেছেন ইব্নে খালদুন। মানবতার জয়গান তাঁর এ সামাজিক বিচারে। তাঁর সারমর্ম তিনি পবিত্র আল-কুরআনের মহাবাণী ও মহানবীর অর্থবহ ইঙ্গিতগুলোতেই লক্ষ্য করেছেন। ইসলামের ঐতিহ্য ও দৃষ্টিকোণ তাঁর সামাজিক বিচারের মাপকাঠি। জীবনবোধের পরশ-কাঠি।

'মজুরের গায়ের ঘাম মুছে যাবার আগে তার পাওনা মিটিয়ে দাও।' মেহনতি মানুষের জন্যে এতো বড়ো কথা কোথায় রয়েছে তোমরা খুঁজে নাও। সেটাই আমাদের পথ। সে পথেরই দিশারী ইবনে খালদুন। মানবতার জয়ের পথের নির্দেশিত হয়েছে তারই সামাজিক বিশ্লেষণে। দুনিয়ার মজলুম মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকারের বলিষ্ঠ জবাব ইব্নে খালদুন।

তাহ'লে বোঝো, ইবনে খালদুন কি চেয়েছেন। গ্রামকে ভালো-বেসেছেন। বেদুইনদের দেখেছেন। দেখেছেন গ্রাম-গঞ্জের প্রকৃতিকে। গ্রাম-গঞ্জকে উপেক্ষা করলে কোনো শাসকই টিক্তে পারে না। চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়েছেন ইবনে খালদুন।

ইবনে খালদুন বলেছেন, তিনিই রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে সবচাইতে উপযুক্ত যিনি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেন। জনগণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সবসময়ে ওয়াকিফহাল হ'তে হবে। প্রজাদের সামাজিক ব্যাপারে তাঁকে আগ্রহী হ'তে হবে। নাগরিক-বৃত্তির সুকোমল প্রকাশে তাঁকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শাসককে একান্তভাবে কামনা করতে হবে সকল নাগরিকের কল্যাণ। এ কল্যাণকামী মনোভাবই শাসককে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক সুন্দর হ'লে শাসক শাসিতের কাছাকাছি থাকে। প্রজার কল্যাণ কামনাতেই একটি দেশ উন্নতি

করে। শাসক প্রজাদের চাইলে প্রজারাও শাসককে চায়। শাসক ক্ষমতা-লোভী হ'লে চক্রান্ত করেন। মহল-ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল রচনা করেন।

শাসককে ক্ষমাশীল হ'তে হবে। অতিবুদ্ধি শাসককে বিপথে চালিত করে। ক্ষমতাকে আঁকড়িয়ে রাখবার ঝুঁকি গ্রহণে সাহায্য করে। বুদ্ধির ঢেকি হ'লে চলবে না। আবার অতি চালাকের গলায় দড়ি।

শাসক অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান করবেন। আইনের শাসন কায়েম করবেন। শাসক একটি ভারসাম্য রক্ষা করবেন। বিপদে ধৈর্য, সংগ্রামে সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবিধানকারী, বিবেচনায় ন্যায়-বান, উন্নয়নে সমন্বয়রক্ষাকারী, যোগাযোগে দরদী ও জনগণের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত-প্রাণ এবং আবেদনে সংবেদনশীল হবেন— এটাই ইবনে খালদুনের বক্তব্য। শাসককে আল্লাহ্ই সকল শক্তির উৎস ব'লে মনে করতে হবে এবং ধর্মের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।

শাসকের সকল প্রচেষ্টাতেই কল্যাণ কামনা থাকবে। শাসককে জনগণের কাছাকাছি থাক্তে হবে। আল্লাহ্কে সব-জান্তা ও সর্বক্ষমতাময় হিসাবে জানলেই নিজেকে খেয়ালখুশী মাফিক পরিচালিত করবেন না। শাসককে পুরাপুরি মনে করতে হবে জনগণই তাঁর ঠিকানা। শাসকের এ ঠিকানা জনগণ জানলেই মুক্তি ও শান্তি।

রাষ্ট্রনায়ক তোমাদের আমাদের সবার জন্যে। তোমরা বড়ো হ'লে ইবনে খালদুনের দেয়া ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েই নেতা হ'তে পারবে। পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরদের জন্যেও এটাই ইবনে খালদুনের একান্ত কামনা, একান্ত বাসনা।

তোমাদের কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ পথ মানতে হবে। আল্লাহ্ ও ধর্ম মানুষের জন্য শক্ত খুঁটি। সেজন্য ইবনে খালদুন আল্লাহ্র নির্দেশিত পথকে সঠিক কাঠামো ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। কোনো রাষ্ট্রপতি যদি আল্লাহ্কে তাঁর পথ নির্দেশক ব'লে গ্রহণ না করে, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে অভিশপ্ত।'

যে-কোনো বিপ্লবের সংহতি হচ্ছে পূর্বশর্ত। ধর্ম মানব সমাজকে সংহতি দেয়। যে-কোনো বিপ্লবে সংহতি না থাকলে

পরাজয় বরণ করতে হবে। রসূলে করিম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যদি অন্যায় কারো চোখে পড়ে, তাহ'লে তা নিজের শক্তি দ্বারা সংশোধন ক'রো। যদি সেটাতেও একান্তভাবে সংশোধন সম্ভব না হয় তা'হলে মুখে তার প্রতিবাদ করো। মৌখিক প্রতিবাদেও যদি কাজ না হয়, তা'হলে অন্তরে-অন্তরে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করো।

এ অন্তরের ঘৃণাই একটি মানব জোটের মধ্যেও সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

ইবনে খালদুন ইসলামের মহান দিকগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের পথে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম, ইবনে খালদুন এ-ও অনুভব করেছেন। শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ুয়াদের বোঝাতে চান, তা সহজ ও সরলভাবে পেশ করতে হবে। হয়তো পড়ুয়ারা সব বুঝবে না; একটি মোটামুটি ধারণা নিতে পারলেই চলবে। তাতেই কাজ হবে উত্তরণের। বিষয়টির উপর কৌতূহলী হ'লেই শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে ব্যাপক ধারণা নিতে পারবে। কারণ অভিজ্ঞতাই মানুষের সবকিছু।

শিক্ষক পরে আর একটু বিশদ হবেন। এবার বিষয়-বস্তু হয়তো আর ঘোলাটে নাও ঠেকতে পারে। প্রশ্ন ও উত্তরের বিনিময় হবে এ পর্যায়ে। কারণ কৌতূহল জন্মালেই জিজ্ঞাসা মনে জাগবে।

তারপর আরেক দফা আলোচনায় হয়তো সবকিছুই খোলাসা হ'য়ে যাবে। জ্ঞানার্থী তখন আরো জানার জন্যে নিজেই চেষ্টা করবে।

শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারবে পুরো দক্ষতা। বিষয়টির রূপ রেখা হয়তো রেখাপাত করবে তার মনে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হতে হবে মধুর ও পবিত্র।

ভুল শিক্ষা আমাদের সবাইকে বিপথে চালিত করে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, অনুশীলনের একটি সৃজনী শক্তি ও জ্ঞানার্থীদের কাছে আস্থাভাজন শিক্ষকই জ্ঞানের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়।

কোনো একটি বিষয়ের জন্যে অনেকগুলো বই পাঠ্য করা ঠিক নয়। অনেকগুলো বইয়ের ভারে ছাত্ররা শব্দ ও বাক্য নিয়ে বিভ্রাটে পড়ে। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিষয়টি বুঝবার

পক্ষে সহায়ক নয়। শব্দ ও বাক্যের বিভ্রাটে যে প্রমাদ তাতে ছাত্রগণ কি বাক্য ও শব্দই আয়ত্ত করবে না বইয়ের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করবে? মুশকিল হয়।

নোট বই সম্পর্কে ইবনে খালদুন তির্যক। তাহ'লে বোঝো, প্রায় দু'শো বছর আগেও ইবনে খালদুন নোট বইয়ের অপকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন।

মুসলমান অনেক জ্ঞানীই পথের দিশা দিয়েছেন। ধরো, ইবনে সীনার মৃত্যুর হাজার বছর পূর্তি হচ্ছে উনিশশো আশি সালে। তাঁর চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও দর্শন আশ্চর্য ক'রে দিয়েছে বিশ্বকে। তোমরা যেমন ইশপের গল্প শুনে খুশী হও। রুমীর গল্পগুলোও খুশী করবে তোমাদের। অংকের ম্যার-প্যাচে কিন্তু আল-বেরুনী ও উমর খৈয়াম তোমাদের অবাক ক'রে দেবেন।

পড়ুয়াদের প্রতি সদয় হতে হবে। তাদের কিন্তু ভয় পাইয়ে দিলে চলবে না। তাতে তারা তাদের আত্মনির্ভরতা হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা ফাঁকি দিতে চায়। অশুভ কাজকে আঁকড়িয়ে ধরে। নকলের পথ গ্রহণ করে। বুঝতেই পারছো, ইবনে খালদুন শিক্ষকদের তোমাদের আদব ও স্নেহের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তোমাদের নিয়ে ইবনে খালদুনের কতো চিন্তা-ভাবনা, তাই না?

ইবনে খালদুন কিন্তু তোমাদের জন্যে আরো মজার খবর দিয়েছেন। রসূলে করিম বলেছেন ঃ বিদ্যা শিক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।

ইবনে খালদুন দূর-দূরান্তে ভ্রমণ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক, বলেনেছ তোমাদের। এটা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সুখবর। তোমরা তো বেড়াবার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়েই আছো।

জ্ঞানের শেষ নেই

তোমরা কি যেতে চাও না দূর-দূরান্তরে? যাও না একবার ঘুরে এসো ইবনে খালদুনের কায়রোতে। যাও না তাঁর দেশ তিউনিসিয়ায়। ফেজ টুপি মাথায় দিয়ে মরক্কোতে। আর না হয় যাও সিরিয়া, আলজিরিয়া, ইরাক, জর্দান আর স্পেনে। গ্রানাডার মর্মর প্রাসাদ আল হামরা, মিশরের পিড়ামিড আর দামেশক্—এগুলো দেখতে

তোমাদের মন চায় না? দেখতে চাও না দুনিয়ার অনেককিছু? এ দেখাই জ্ঞানের পথ দেখায়। কৌতূহল জাগায়। মেটায় জ্ঞানের তৃষ্ণা।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের মুয়াজ্জিন কি সুন্দর আজান দেয়।

সে সুমিষ্ট আজান তোমাদের আহবান জানায় জ্ঞানের পথে।

ইবনে খালদুন এবং খালদুন-বাদ আজকের মানুষের যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব। এ জবাব তোমাদের খুঁজে-পেতে নিতে হবে।

আজকে মানুষ জাগছে। দিকে দিকে মানুষের জয়গান। ইবনে খালদুনের মানুষরা যেন জাগতে চায়। বাঁচতে চায়।

এ জাগা আর বাঁচার প্রশ্নে ইবনে খালদুন চেয়েছেন, তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ হও। মিলন-সেতু রচনা করো দেশে দেশে। ধর্মকে আঁকড়িয়ে ধরো। মহানবীর মহাবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হও। মহামানবতার মহাপথে পথ খুঁজে নাও। জ্ঞানের পথ।

ইবনে খালদুন তোমাদের কাছে চান না আর কিছু। শুধু একটু কৌতূহল। একটু জানাজানি। আর কি চাইতে পারেন তিনি?

ইবনে খালদুন তোমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন তাঁর কেতাব-গুলো। সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো। গোটা দুনিয়াটা তিনি তোমাদের সামনে ধ'রে রেখেছেন। তোমরা ঘুরে বেড়াও।

তোমরা রাজপুত্তুররা খুদে খুদে ইবনে খালদুন হও। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে বেড়াও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল জ্বালাও।

ইবনে খালদুনের তাতেই শান্তি। তাতেই সুখ।

॥ হে আমার প্রতিপালক জ্ঞান দাও ॥